দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 7 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার নানান দুর্নীতি, অসঙ্গতি ও ত্রুটি পর্যালোচনা করে উপস্থাপন করা হয়েছে কতিপয় সুপারিশ, যা শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ঃ

মমতাজ বিলকিস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ডঃ মাহবুবুর রহমানকে শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেবার মতো গর্হিত অন্যায়সহ পরীক্ষা কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে সিন্ডিকেটের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের করে দেয়া হয়েছে।

এমন ঘটনা একটি-দু'টি নয়। বিভিন্ন বিভাগের বেশকিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের এই চিত্র আমাদের দারুণভাবে হতাশ করছে। দেশের বোর্ডগুলোও পিছিয়ে নেই।

পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের ৬০ কর্মকর্তাকে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি আর কাজে অবহেলার জন্য শাস্তিস্বরূপ বদলি করা হয়েছে। বিভিন্ন কলেজে এঁদের পোস্টিং দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এঁরা বোর্ডগুলোতে কর্মরত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে কোন কোন স্কুল-কলেজের একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির গোপন আঁতাত গড়ে ওঠে। যার বলে তারা পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছিল। নিরপরাধ ছাত্ররা হচ্ছিল পরিস্থিতির শিকার। টাকার বিনিময়ে যারা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলত। যাদের পাপে অসহায় অভিভাবক আর নিষ্পাপ ছাত্রদের জীবনে এনে দিত ঘনঘোর দুর্দশা। তাদের শাস্তি কি হলো– না বদলি করা হলো। এসব চিহ্নিত অপরাধীর কার্যকলাপে যেসব কোমলমতি ছেলেমেয়ে জীবনের চরম ক্ষতি আর গ্লানির সম্মুখীন হলো তাদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে আমার জানা নেই।

দেশের পাঁচটি বোর্ডের এইচএসসির রেজাল্টে দেখা যায়, শতকরা ৫৪ ভাগ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। পাঁচটি বোর্ডে সম্মিলিত প্রশ্নপত্রের অধীনে একযোগে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট চার লাখ ৭৯ হাজার ২৮ পরীক্ষার্থী। আড়াই লাখের উপরে ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হতে পারেনি। কিন্তু কেন? এদের ভবিষ্যতই বা কি?

প্রাথমিক অবস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরেই লেখাপড়ার মান ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে আর এ কারণেই বাড়ছে জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে অকৃতকার্যের হার। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, এক সময়কার মানুষ গড়ার কারখানা হিসাবে পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ চলমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

রাজধানীর কয়েকটি নামকরা স্কুলের কথা জানি যেখানে এ বছর ছাত্রভর্তির জন্য বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই নাম লেখাতে হয়েছে এবং গত বছরের মাঝামাঝি ভর্তিও সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভর্তি ফিস সাত থেকে দশ হাজার, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। এ স্কুলগুলোতে অভিভাবকরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।

শিশুদের কথা শেখার আগেই পড়ালেখা শেখানোর তাগিদ আমরা অভিভাবকরা দারুণভাবে অনুভব করতে থাকি আর সেই মোতাবেক কাজও করি। এরপরে ভাল টিচারের বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় প্রাইভেট পড়াবার নিমিত্তে। কিউ লেগে যায় ভাল স্কুলগুলোর শিক্ষকদের দোরগোড়ায়। শিক্ষার্থী যতই উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকে ছোটাছুটি ততই বেড়ে যায়। এসএসসি পরীক্ষার আগে প্রতিটি বিষয়ের জন্য টিচার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কোচিং সেন্টারগুলো হয়ে ওঠে সরগরম। অথচ প্রতিবছর দেখা যাচ্ছে শতকরা অর্ধেকের বেশি ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হচ্ছে। এ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রতিবছর অগণিত ছাত্রছাত্রী শিক্ষা সম্পৃক্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে অকৃতকার্য হবার ফলে। যেন এটাই স্বাভাবিক। তাহলে সেই শিশুকাল থেকে এত ব্যাপক আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা কি?

শিক্ষার মান যাচাইয়ের উদ্দেশে প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এসব পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে থাকে। দশ বছর আগে যেখানে প্রতিটি বোর্ডের বাজেট ছিল পাঁচ-কোটি টাকার মতো এখন তা বেড়ে প্রায় দশ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মানের দিক থেকে ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকলের ছড়াছড়ি, কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি–বিষয়গুলো পাবলিক পরীক্ষা দু'টির মান ভীষণভাবে কমিয়ে ফেলেছে। নকলের দাবিতে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিণত হচ্ছে রণক্ষেত্রে। আর সে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপক এলাকা জুড়ে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রশাসন পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা সকল কাজকর্ম ফেলে পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর পরীক্ষার সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক। পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ– প্রতিটি ধাপে রয়েছে অনিয়ম আর দুর্নীতি। পরীক্ষা দুটিতে অসদুপায়ের কথা লিখতে চাইলে সে এক বিরাট কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে। গত বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় কোন এক পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল সাপ্লাইকারী এক তরুণ দোতলার সানসেটের ওপর দাঁড়িয়ে নকল বলে দেবার সময় কাগজটি পড়ে যায় নিচে পরিদর্শকের সামনে। নকল সরবরাহকারী যুবকটি উক্ত পরিদর্শককে নকল লেখা কাগজটি তুলে দেবার আদেশ করে– এমন ঘটনাও এ দেশে ঘটে। এছাড়া নকল করতে দেবার দাবিতে সড়ক অবরোধ, ভাংচুর, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পর্যন্ত লাঞ্ছিত করার ঘটনা নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোথাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে গুলি পর্যন্ত ছুড়তে হয়েছে।

পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা নিয়ে ঘন ঘন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত ও বাস্তবমুখী করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় যে কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে বা তা কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করতে পারে। তবে, সব ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ঘোষণা দেবার আগে ভেবে দেখতে হবে সেটা কতখানি সময়োপযোগী। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হলে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল দেশের পাঁচটি বোর্ডের অধীনে সকল পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগে কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, সকল বোর্ডের পড়াশোনার মান এক কিনা। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বোর্ডের অধীনে যখন পরীক্ষা নেয়া হতো তখনই প্রতিটি বোর্ডের কার্যাবলী স্ব স্ব বোর্ডের কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এখন এক সাথে পাঁচটি বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা কতখানি সম্ভব হবে তা সহজেই অনুমেয়। যদি সম্ভব হবেই তাহলে প্রায় সব প্রশ্নই ফাঁস হয়ে যায় কিভাবে?

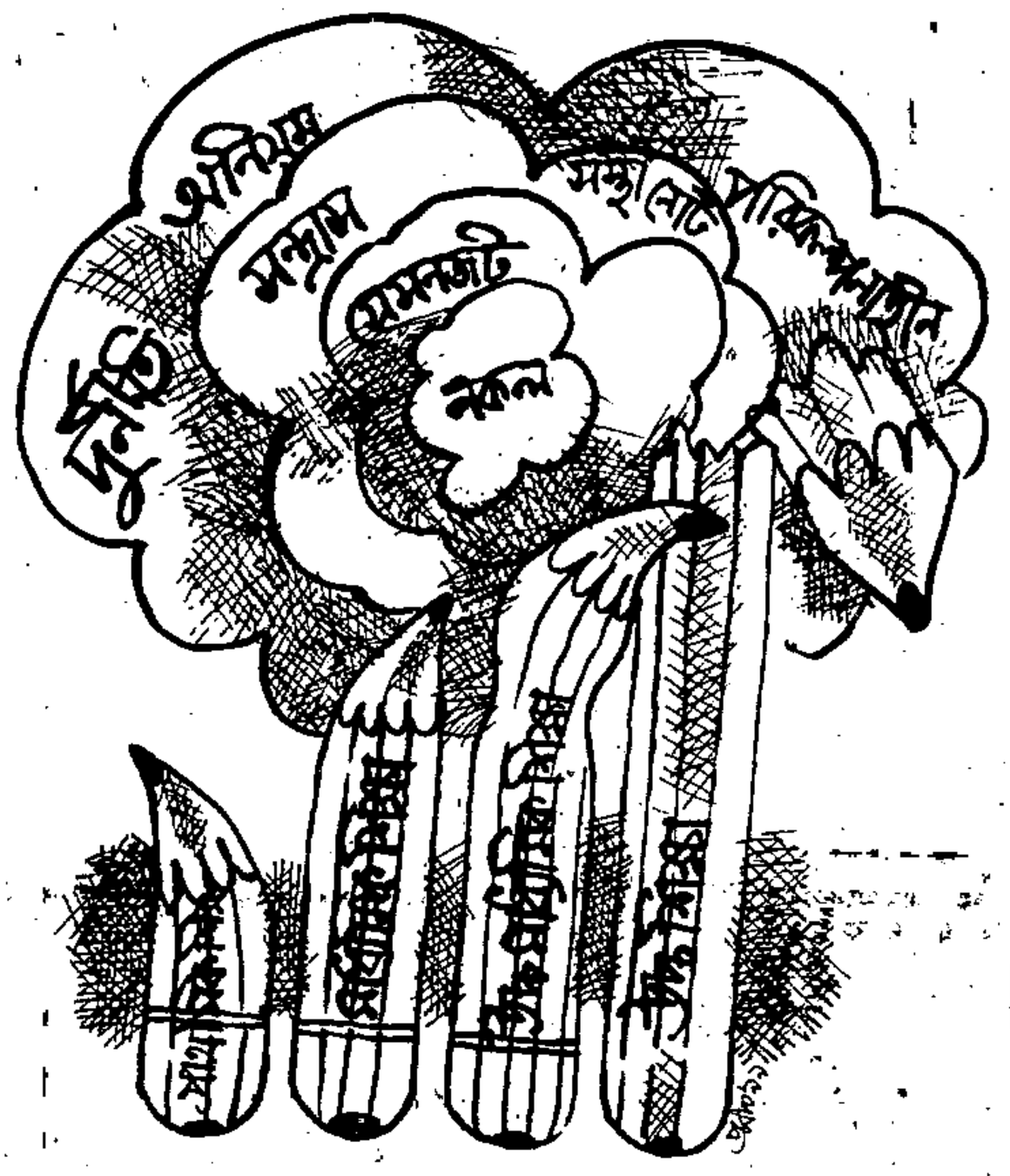

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষাবোর্ডের ওপর ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলে দিন দিন আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন বোর্ডে কি রকম দুর্নীতি চলে। রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে ফলাফল অবধি দুর্নীতির কাহিনী আজ আর কারও অজানা নয়। কম্পিউটারের কেরামতির ফলে অতীতে যে সব তেলেসমাতি কাণ্ড হয়েছে তা কমে এলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখন অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে রেজাল্ট কেনাবেচা চলছে বলে শোনা যায়।

বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে যারা পাবলিক পরীক্ষাগুলোর কঠিন মহাসাগর সাঁতরে কূলে ভিড়ল আসন সঙ্কটের কারণে তাদের অনেকেই ভর্তি হতে পারছে না। এ বছরই শতকরা ৩০ ভাগ এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী কোথাও ভর্তি হতে পারবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত বছরে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মোট ২ লাখ ২০ হাজার ৭শ' ৪৮ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ আসন সংখ্যা রয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজারের মতো। এতে সব মিলিয়ে ৫৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আসন সঙ্কট থেকে যাবে। এ বছর প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৬০ জন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আসনে ভর্তি হতে পারবে না। কারণ এ বছর প্রথম বিভাগে পাস করছে সারা দেশে সর্বমোট ৪৬ হাজার ৯৯৯ ছাত্রছাত্রী। অথচ ১২টি মেডিক্যাল কলেজসহ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা রয়েছে ১৬ হাজার ৪শ'টি। ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং স্নাতক পর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য এবার গতবারের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এ সত্ত্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নেই।

এসএসসি পাস করার পর কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার চিত্রও তথৈবচ। রাজধানীর প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য অকল্পনীয় ব্যাপার। একজন ছাত্রকে একাধিক কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। কলেজগুলোও কৌশলের জাল পেতে রাখে ছাত্রছাত্রী ধরার জন্য। সাধারণ ভাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হবার আগেই ঐ কলেজগুলো ভর্তি পর্যন্ত সম্পন্ন করে ফেলে। যেহেতু বোর্ডের আদেশ বলে ভর্তির সময় কলেজে আসল মার্কশীট জমা দিতে হয় ফলে পরবর্তীতে ভাল কলেজ কিংবা সরকারী কোন কলেজে সেই শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পূর্বের কলেজে জমা দেয়া মার্কশীট তুলতে পারে না। কলেজ কর্তৃপক্ষের পেতে রাখা ফাঁদে তাদের জড়িয়ে পড়তে হয় এবং অপেক্ষাকৃত ভাল সুযোগ থেকে তার বঞ্চিত হচ্ছে অহরহ।

শিক্ষাব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান পরিস্থিতি এমন যে, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর উচ্চতর ডিগ্রী না নিয়ে কোন উপায় থাকে না। অথচ উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই সব হতাশাগ্রস্ত বেকার যুব সমাজ যারা নিজেদের জন্য কিছু করতে পারছে না তাদের কাছ থেকে দেশ ও দশের উপকার হবে এ আশা করা যায় না। অথচ তারাই দেশের ভবিষ্যত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব বিপুল বাধা ও অনিয়ম অপসারিত করে সুষ্ঠু ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন––

- শিক্ষা বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর করার পূর্বে পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে উন্নত, সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ করার বিষয়টি ভাবতে হবে সবার আগে।
- এরপরই দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে।
- ভর্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রাইভেট কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে সিট সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।
- বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ এখানে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার, শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবিলম্বে ঢেলে সাজাতে হবে। দেশের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষায় কারিগরি বা টেকনিক্যাল শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে হবে। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, যোগাযোগ, চিকিৎসা পরিবেশ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত শিক্ষা কার্যক্রম দেশ ও জাতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় গুণগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।